بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৭ নভেম্বর, ২০২৩ মোতাবেক ১৭ নবুয়্যত, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবার শেষের দিকে যে ইতিহাস বর্ণিত হচ্ছিল বা মহানবী (সা.)-এর সীরাত তথা জীবনচরিত বর্ণিত হচ্ছিল সে প্রসঙ্গে ফুরাত বিন হাইয়ান-এর ইসলাম গ্রহণেরও উল্লেখ করা হয়েছিল। তার ইসলাম গ্রহণের আরও বিশদ বিবরণ হলো, সে আটক হয়ে বন্দিদের মাঝে ছিল, যেমনটি গত খুতবায় বর্ণিত হয়েছিল। বদরের যুদ্ধের দিনও সে আহত হয়েছিল। তথাপি সে কোনোভাবে বন্দিদশা থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। এবার পুনরায় সে মুসলমানদের হাতে আটক হয়। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে দেখমাত্রই বলেন, এখনও কি তুমি তোমার কর্মপন্থা পরিবর্তন করবে না? ফুরাত বলে, আমি যদি এবার মুহাম্মদ (সা.)-এর হাত থেকে বেঁচে যাই তাহলে আর কখনো ধরা পড়ব না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করে নাও। অর্থাৎ যদি তুমি বাঁচতেই চাও তাহলে একটিই পদ্ধতি রয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করে নাও। যাহোক, ফুরাত বিন হাইয়ান হযরত আবু বকর (রা.)'র একথা শুনে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর সকাশে যেতে আরম্ভ করে। **নিজের এক আনসার মিত্রের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে বলে যে, আমি তো মুসলমান**। আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, **'সে ইসলাম গ্রহণ করেছে'**। মহানবী (সা.) তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দিয়ে বলেন, **ইন্না মিনকুম রিজালান নাকেলুহুম ইলা ঈমানিহিম**। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তোমাদের মাঝে কতেক এমন মানুষও রয়েছে যাদেরকে আমরা তাদের ঈমানের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যদি বলে যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি তাহলে ঠিক আছে; এটি তার ও আল্লাহ্ তা'লার বিষয়। যাহোক, এ কারণে মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে দেন।

আরেকটি বিবরণ এমনও রয়েছে যে, তৃতীয় হিজরী সনের জমাদিউল আখের মাসে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র একটি অভিযান 'কারাদা' নামক স্থান অভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছিল। সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) এই ঘটনাটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেছেন যে,

বনু সুলায়েম ও বনু গাতফানের আক্রমণ থেকে কিছুটা অবকাশ পেতেই আরেকটি বিপদকে প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের স্বদেশ থেকে বের হতে হয়েছে। এতদিন কুরাইশরা নিজেদের উত্তরাঞ্চলে বাণিজ্যের জন্য সাধারণত হেজাযের সমুদ্রতীরবর্তী পথ দিয়ে সিরিয়ায় গমন করত। কিন্তু এখন তারা উক্ত পথ পরিহার করে, কেননা এই অঞ্চলের গোত্রগুলো মুসলমানদের মিত্র হয়ে গিয়েছিল; আর কুরাইশদের জন্য দুষ্কৃতির সুযোগ কম ছিল। বরং এমন পরিস্থিতিতে তারা এই সমুদ্রতীরবর্তী রাস্তাকে স্বয়ং নিজেদের জন্য বিপদের কারণ বলে মনে করত। অর্থাৎ কারণ শুধু এটিই ছিল না যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল, বরং তারা নিজেরা যেসব দুষ্কৃতি করতে চাইত, এখন সেসব গোত্রের মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কারণে তাদের ধারণা ছিল

যে, আমরা এখন আর তা করতে পারব না এবং মুসলমানদের ক্ষতি করতে পারব না। যাহোক, এখন তারা উক্ত পথ পরিহার করে নজদ-এর রাস্তা বেছে নেয়, যা ইরাক অভিমুখে যেত। আর যার আশেপাশে কুরাইশদের মিত্র এবং মুসলমানদের প্রাণের শত্রুরা ছিল। পূর্বের (যাতায়াত) পথগুলো এমন ছিল যাদের সাথে মুসলমানদের চুক্তি হয়েছিল। আর সেই পথ যেটিকে কুরাইশরা বেছে নিয়েছিল সেখানে ছিল তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ (গোত্রগুলো)। আর সেসব মানুষ এবং গোত্রের বসবাস ছিল যারা মুসলমানদেরও প্রাণের শত্রু ছিল, আর তারা ছিল সুলায়েম ও গাতফান গোত্র। অতএব জমাদিউল আখের মাসে মহানবী (সা.) এই সংবাদ পান যে, মক্কার কুরাইশদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা নজদ-এর পথ দিয়ে অতিক্রম করতে যাচ্ছে। এমনিতেই কুরাইশদের কাফেলাগুলোর সমুদ্রতীরবর্তী পথ দিয়ে যাতায়াত মুসলমানদের জন্য আশঙ্কার কারণ ছিল। সেক্ষেত্রে নজদের পথ দিয়ে তাদের যাতায়াতও তেমনই বরং তার চেয়ে বেশি আশঙ্কাজনক ছিল। কেননা সমুদ্রতীরবর্তী রাস্তার বিপরীতে এই পথে কুরাইশদের মিত্রদের বসতি ছিল, যারা কুরাইশদের মতোই মুসলমানদের রক্তপিপাসু ছিল। আর যাদের সাথে মিলে কুরাইশরা অতি সহজেই মদীনায় চোরাগোপ্তা আক্রমণ চালাতে পারত অথবা কোনো দুষ্কৃতি করতে পারত। এছাড়া কুরাইশদের দুর্বল করার এবং তাদেরকে সন্ধি করতে সম্মত করানোর জন্যও এই পথে তাদের কাফেলাগুলোর যাতায়াত প্রতিহত করাও আবশ্যক ছিল। এ কারণেই মহানবী (সা.) এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসা (রা.)'র নেতৃত্বে স্বীয় সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন। কুরাইশের এই বাণিজ্যিক কাফেলায় আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়্যা'র মতো (জ্যেষ্ঠ) নেতারাও উপস্থিত ছিল। যায়েদ (রা.) পরম নৈপুণ্য ও সতর্কতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করেন আর নজদ-এর 'কারাদা' নামক স্থানে ইসলামের এই শত্রুদের ধরে ফেলেন। আর এই অতর্কিত আক্রমণে বিচলিত হয়ে কুরাইশ সদস্যরা কাফেলার মালপত্র এবং (সাথে বহন করা) তাদের যে সম্পদ ছিল তা ফেলে পালিয়ে যায়। আর যায়েদ বিন হারেসা (রা.) এবং তার সঙ্গীরা বিশাল (পরিমাণ) গণিমতের মালসহ সফল ও বিজয়ী হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, কুরাইশের এই কাফেলার পথপ্রদর্শনকারী ছিল ফুরাত নামের এক ব্যক্তি, যে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয় আর ইসলাম গ্রহণের কারণে মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের গুপ্তচর ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে হিজরত করে মদীনায় চলে আসে।

সেই দিনগুলোরই একটি ঘটনা হলো কা'ব বিন আশরাফের হত্যা সংক্রান্ত। কা'ব বিন আশরাফ মদীনার একজন সর্দার বা নেতা ছিল। আর মহানবী (সা.)-এর সাথে চুক্তিভুক্ত ছিল। কিন্তু সন্ধি করার পর সে নৈরাজ্য ছড়ানোর চেষ্টা করে আর মহানবী (সা.) তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন। বুখারীতে এই ঘটনার বিশদ বিবরণে লেখা আছে যে,

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, কা'ব বিন আশরাফের সাথে কে বোঝাপড়া করবে? সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) দণ্ডায়মান হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কি চান, আমি তাকে হত্যা করি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। অতএব মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) কা'ব-এর কাছে আসেন আর বলেন, সেই ব্যক্তি আমাদের কাছে সদকা চেয়েছেন আর তিনি আমাদেরকে

কঠিন অবস্থায় নিপতিত করেছেন। {অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি এই কথা বলেন, তিনি আমাদের কাছে সদকা চেয়েছেন এবং আমাদেরকে কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছেন।} আমি তোমার কাছে ধার নিতে এসেছি। সে বলে, খোদার কসম! তুমি তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে। {অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যাবে এবং পিছু হটবে।} যাহোক, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আমরা যেহেতু তাঁর অনুসারী হয়েছি তাই আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করা পছন্দ করি না যতক্ষণ না আমরা দেখব যে, তাঁর পরিণতি কী হয়। আর আমরা চাই তুমি আমাদেরকে এক বা দুই ওয়াসাক ধার দাও। কা'ব বলে, তাহলে আমার কাছে কিছু একটা বন্ধক রাখো। তিনি বলেন, তুমি কী চাও? সে অর্থাৎ কা'ব বলে, তোমাদের নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বলেন, তোমার কাছে আমাদের নারীদের আমরা কীভাবে বন্ধক রাখতে পারি যখন কিনা আরবদের মাঝে তুমি সবচেয়ে সুদর্শন? সে বলে, তাহলে তোমাদের পুত্রদের আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বলেন, আমরা তোমার কাছে নিজেদের পুত্রদের কীভাবে বন্ধক রাখতে পারি? তাদের প্রত্যেককে এই খোঁটা দেওয়া হবে (বা একথা) বলা হবে যে, তাদেরকে এক বা দুই ওয়াসাক (খাদ্যের) বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছিল। এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক, কিন্তু (আমরা) তোমার কাছে নিজেদের বর্মগুলো বন্ধক রাখছি। (এখানে বর্মগুলো বলতে যুদ্ধ সামগ্রী বুঝানো হয়েছে।) অতঃপর তিনি পুনরায় কা'বের কাছে আসার অঙ্গীকার করেন। অতএব, তিনি রাতের বেলা তার কাছে আসেন এবং তার সাথে আবু নায়েলাও ছিলেন, যিনি কা'বের দুধভাইও ছিলেন। সে তাদেরকে দুর্গের ভেতরে ডাকে আর তারা যখন তার কাছে দুর্গের অভ্যন্তরে যায় তখন সে তার বালাখানা বা ওপর তলা থেকে নীচে নামে। তার স্ত্রী তাকে বলে, এসময় তুমি কোথায় যাচ্ছ? কা'ব বলে, এরা (হলো) মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং আমার ভাই আবু নায়েলা। তারা ডেকেছে (তাই) তাদের কাছে যাচ্ছি। (তখন) তার স্ত্রী বলে, আমি এমন শব্দ শুনছি যেন তা থেকে রক্ত ঝরছে। কা'ব বলে, সম্মানিত ব্যক্তিকে রাতের বেলা আক্রমণের জন্য ডাকা হলেও সে যাবে? যাহোক, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) নিজের সাথে আরো দুজনকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) সেই লোকদেরকে বলেন, কা'ব যখন আসবে তখন আমি তার চুল ধরবো এবং তাকে শুঁকবো। তোমরা যখন দেখবে যে, আমি তার মাথা শক্ত করে ধরে ফেলেছি তখন তোমরা এগিয়ে এসে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিবে। এরপর কা'ব গায়ে চাদর জড়িয়ে তাদের কাছে নীচে নেমে আসে এবং তার কাছ থেকে সুগন্ধির সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছিল। (তখন) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, আজকের মতো সুগন্ধির (সৌরভ) আমি কোথাও পাই নি, অর্থাৎ সর্বোত্তম সুগন্ধি। কা'ব বলে, 'আমার কাছে আরবের সর্বাপেক্ষা অধিক সুগন্ধি ব্যবহারকারিণী ও সবচেয়ে বেশি সুন্দরী রমণী রয়েছে।' মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) বলেন, 'আমাকে তোমার মাথা শুঁকার অনুমতি দিবে কি?' সে অনুমতি দিলে তিনি তার (মাথা) শুঁকেন এবং নিজের সঙ্গীদেরকেও শুঁকান। পুনরায় তিনি বলেন, আমাকে আরেকবার (শুঁকার) অনুমতি দিবে কি?' সে অনুমতি দেয়, এরপর যখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তাকে শক্ত করে ধরে ফেলেন তখন নিজের সঙ্গীদেরকে বলেন, তোমরাও তাকে ধরো, তখন তারা তাকে হত্যা করেন। এরপর তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং তাকে (হত্যার) সংবাদ দেন।

কা'বের আহত হওয়ার আরো বিশদ বিবরণ বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ (শরাহ্) উমদাতুল কারী'তে লেখা আছে যে, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার সঙ্গীদের সাথে যখন কা'ব বিন আশরাফের ওপর আক্রমণ করেন এবং তাকে হত্যা করেন তখন তার একজন সঙ্গী হযরত হারেস বিন অওস (রা.)'র (শরীরে) তরবারির ফলার আঘাত লাগে এবং তিনি আহত হন। (নিজের সঙ্গীদের তরবারির ফলার আঘাতে আহত হয়েছিলেন।) অতএব, তার সঙ্গীরা তাকে তুলে নিয়ে দ্রুততার সাথে মদীনায় পৌঁছেন এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। এরপর মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন অওস (রা.)'র ক্ষতস্থানে নিজের মুখের লালা লাগিয়ে দেন, এরপর তার আর কোনো কষ্ট হয় নি।

সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনাটি যেভাবে লেখা হয়েছে তার সারাংশ এখন আমি এখানে বর্ণনা করব।

বদরের যুদ্ধ মদীনার ইহুদীদের হৃদয়ে লালিত শত্রুতাকে যেভাবে দৃশ্যপটে নিয়ে আসে এবং বনু কায়নুকাকে দেশান্তরিত করাও (যখন) অন্যান্য ইহুদীদের সংশোধনের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে নি এবং তারা তাদের দুষ্কৃতি এবং নৈরাজ্যে ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। অতএব, কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনাও এই ধারাবাহিকতারই একটি ফলাফল। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কা'ব ইহুদী হলেও প্রকৃতপক্ষে সে ইহুদী বংশোদ্ভূত ছিল না, বরং আরব ছিল। তার পিতা আশরাফ, বনু নাবহানের এক চতুর এবং ধূর্ত ব্যক্তি ছিল, যে মদীনায় এসে বনু নযীরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের মিত্র সাজে, আর অবশেষে সে এতটা ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করে যে, বনু নযীরের জ্যেষ্ঠ রইস বা নেতা আবু রাফে' বিন আবুল হাকীক তার মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেয়। সেই মেয়ের গর্ভেই কা'বের জন্ম হয়, যে বড় হয়ে তার পিতার চেয়েও অধিক মর্যাদা অর্জন করে। অবশেষে সে এমন পদমর্যাদা অর্জন করে নেয় যে, সমগ্র আরবের ইহুদীরা তাকে নিজেদের সর্দার বা নেতা জ্ঞান করতে আরম্ভ করে। কা'ব একজন জ্ঞানী ও সুপুরুষ হওয়ার পাশাপাশি একজন প্রতিভাবান কবি ও অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। সর্বদা নিজ জাতির ওলামা এবং অন্যান্য প্রভাবসম্পন্ন লোকদেরকে নিজের আর্থিক উদারতা দ্বারা নিজের করতলগত করে রাখতো, কিন্তু চারিত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে চরম নোংরা স্বভাবের মানুষ ছিল। আর গোপন ষড়যন্ত্র এবং শত্রুতার কৌশলে সে ছিল সিদ্ধহস্ত। [এমন কোনো মন্দ নেই যা তার মাঝে ছিল না]। মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদীনায় আসেন তখন কা'ব বিন আশরাফও অন্যান্য ইহুদীদের সাথে একাত্ম হয়ে সেই চুক্তিতে যোগদান করে যা মহানবী (সা.) এবং ইহুদীদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা ও সম্মিলিত প্রতিরক্ষা সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বাহ্যত সে এই চুক্তি করেছিল ঠিকই, কিন্তু আভ্যন্তরীণভাবে কা'বের হৃদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষের অগ্নি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। আর সে গোপন কৌশল ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী (সা.)-এর বিরোধিতা আরম্ভ করে। বর্ণিত আছে, কা'ব প্রতিবছর ইহুদী আলেম-ওলামা ও মাশায়েখদের অনেক উপহার-উপঢৌকন বা ভাতা প্রদান করত, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর হিজরতের পর যখন তারা নিজেদের বার্ষিক অযিফা বা ভাতা নেওয়ার জন্য তার কাছে যায় তখন সে কথাচ্ছলে তাদের কাছে মহানবী (সা.)-এর উল্লেখ করতে থাকে এবং তাদের কাছে তাঁর (সা.) সম্পর্কে ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর আলোকে মতামত জানতে চাইলে তারা বলে, বাহ্যত তো তিনি সেই নবী বলেই মনে হয়, তওরাতে

আমাদেরকে যাঁর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই উত্তরে কা'ব খুবই রাগান্বিত হয় এবং সবাইকে অনেক গালমন্দ করে বিদায় করে দেয়। আর তাদেরকে যে ভাতা প্রদান করত– তা দেয় নি। ইহুদী আলেমদের যখন উপার্জন বন্ধ হয়ে যায় তখন কিছুদিন পর তারা আবার কা'বের কাছে গিয়ে বলে, লক্ষণাবলী অনুধাবনে আমাদের ভুল হয়েছিল; আমরা পুনরায় অভিনিবেশ করেছি। আসলে মুহাম্মদ (সা.) সেই নবী নন যাঁর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এই উত্তরে কা'বের স্বার্থ চরিতার্থ হয় এবং সে আনন্দিত হয়ে তাদেরকে বার্ষিক ভাতা দিয়ে দেয়। যাহোক, এটি ছিল একটি ধর্মীয় বিরোধিতা, যদিও তা অসৌজন্যমূলকভাবে অবলম্বন করা হয়েছিল কিন্তু আপত্তির কারণ হতে পারে না, যাতে সে শাস্তি পাবে আর এর ভিত্তিতে কা'বকে আপত্তির লক্ষ্যেও পরিণত করা যেতে পারতো না। এরপর কা'বের বিরোধিতা ক্রমশ ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। অবশেষে বদরের যুদ্ধের পর সে এমন আচার-আচরণ প্রদর্শন করে যা ছিল চরম নৈরাজ্যকর ও অশান্তির কারণ। যার ফলে মুসলমানদের জন্য চরম আশঙ্কাজনক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আসলে বদরের (যুদ্ধের) পূর্বে কা'ব মনে করত যে, মুসলানদের ঈমানের জোশ বা উদ্দীপনা একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র আর ধীরে ধীরে এসব মানুষ আপনা-আপনি {মহানবী (সা.) থেকে} বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের পিতৃপুরুষের ধর্মে ফিরে আসবে। কিন্তু বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন এক অপ্রত্যাশিত বিজয় লাভ করে আর কুরাইশ নেতাদের অধিকাংশ নিহত হয় তখন সে বুঝতে পারে যে, এখন এই নতুন ধর্ম এমনিতেই নিশ্চিহ্ন হবে বলে মনে হচ্ছে না। কাজেই, বদরের (যুদ্ধের) পর সে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করার লক্ষ্যে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করার বিষয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়। আর তার হৃদয়ের বিদ্বেষ ও হিংসার সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ সেসময় ঘটে যখন বদরের (যুদ্ধের) বিজয়ের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে; তখন এই সংবাদ শুনে কা'ব সাক্ষীস্বরূপ প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ ভুল মনে হচ্ছে, কেননা কুরাইশের এই বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে মুহাম্মদ (সা.)-এর বিজয় অর্জন করা আর মক্কার এমন নামিদামি নেতাদের মাটির সাথে মিশে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই সংবাদ যদি সত্য হয় তাহলে এই জীবনের চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। যাহোক, যখন এই সংবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন হয় এবং কা'বের এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, সত্যিকার অর্থেই বদরের (যুদ্ধের) বিজয় ইসলামকে এমন দৃঢ়তা দান করেছে যা তার কল্পনা বা ধারণাতেও ছিল না, তখন সে রাগ এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং ত্বরিত সফরের প্রস্তুতি নিয়ে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে গিয়ে তার বাকপটুতা এবং (অগ্নিঝরা) কবিতার জোরে কুরাইশের হৃদয়ের সুপ্ত অগ্নিকে দাউদাউ করে জ্বালিয়ে তোলে, অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে। তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের অতৃপ্ত পিপাসা জাগিয়ে তোলে, তাদের বক্ষ প্রতিশোধ ও শত্রুতার অগ্নিতে ভরে দেয়। কা'বের প্রজ্জ্বলিত অগ্নির কারণে যখন তাদের আবেগ-অনুভূতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে তখন সে তাদেরকে কা'বা গৃহের প্রাঙ্গণে নিয়ে গিয়ে কা'বাগৃহের পর্দা তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে এই শপথ আদায় করে যে, 'যতদিন ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন না করব ততদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব না'। মক্কাতে এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার পর এই হতভাগা অন্যান্য গোত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রের কাছে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষজনকে উত্তেজিত করে। এরপর মদীনায় ফিরে এসে সে নিজের উত্তেজক কবিতায় চরম নোংরা ও অশ্লীলভাবে মুসলমান নারীদের (কথা) উল্লেখ করে। এমনকি নবী-পরিবারের সম্মানিত নারীদেরও নিজের নোংরা ও

অশ্লীল কবিতার লক্ষ্যে পরিণত করতে দ্বিধা করে নি। আর দেশের সর্বত্র এসব কবিতা ছড়িয়ে বেড়ায়। অবশেষে সে মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে আর কোনো নিমন্ত্রণ ইত্যাদির অজুহাতে তাঁকে নিজের বাড়িতে ডেকে কতিপয় ইহুদী যুবকের হাতে তাঁকে হত্যা করানোর ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যথাসময়ে এই সংবাদ প্রকাশ পেয়ে যায় আর তার এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়।

বিষয়টি যখন এতদূর গড়ায় আর কা'বের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ, বিদ্রোহ, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথাবার্তা আর হত্যার ষড়যন্ত্র করার অপরাধ প্রমাণিত হয়, তখন মহানবী (সা.), যিনি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে সম্পাদিত সেই চুক্তি অনুযায়ী, যা তাঁর মদীনায় আগমনের পর মদীনাবাসীদের সাথে হয়েছিল, তিনি (সা.) মদীনার গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন। (তাই) তিনি (সা.) এই রায় প্রদান করেন যে, কা'ব বিন আশরাফ নিজের অপকর্মের কারণে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য; এবং নিজের কয়েকজন সাহাবীকে নির্দেশ দেন যে, একে হত্যা করো। কিন্তু কা'বের সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে তখন যেহেতু মদীনার পরিবেশ এমন হয়ে উঠছিল যে, তার বিরুদ্ধে রীতিমত ঘোষণা দিয়ে যদি তাকে হত্যা করা হতো তাহলে মদীনায় এক ভয়াবহ গৃহ-যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল, যার ফলে জানা নেই কতটা রক্তপাত ও প্রাণহানী ঘটতো। আর মহানবী (সা.) যেহেতু সকল সম্ভাব্য এবং বৈধ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মাঝে খুনোখুনি ও রক্তপাতকে বন্ধ করতে চাইতেন, (মুসলমান এবং ইহুদীরা যেন পরস্পর লড়াই করে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, পরস্পরের হাতে নিহত না হয়।) তাই তিনি (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, কা'বকে প্রকাশ্যে (মানুষের সামনে) হত্যা না করে যথোপযুক্ত কোনো সময় বের করে কয়েক ব্যক্তি তাকে গোপনে হত্যা করবে। আর এই দায়িত্ব তিনি অওস গোত্রের নিষ্ঠাবান একজন সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)'র ওপর ন্যস্ত করেন এবং তাকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন, যে রীতি-ই অবলম্বন করবে তা যেন অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)'র পরামর্শক্রমে করা হয়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! গোপনে হত্যা করার জন্য তো কোনো কথা বলতে হবে; অর্থাৎ কোনো অজুহাত ইত্যাদি দেখাতে হবে, যার সাহায্যে কা'বকে তার বাড়ি থেকে বের করে কোনো নিরাপদ স্থানে নিয়ে তাকে হত্যা করা সম্ভব হবে। তিনি (সা.) সেই অসাধারণ ফলাফলকে দৃষ্টিপটে রেখে, যা এ ক্ষেত্রে নীরবে শাস্তি প্রদানের পন্থাকে পরিত্যাগ করলে সৃষ্টি হতে পারতো, এতে সম্মতি প্রদান করেন। কাজেই, মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)'র পরামর্শক্রমে আবু নায়েলা এবং আরো দু'তিনজন সাহাবীকে নিজের সাথে নেন এবং কা'বের বাড়িতে পৌঁছেন এবং কা'বকে তার অন্দরমহল থেকে ডেকে বলেন, আমাদের সাহেব অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের কাছে সদকা বা আর্থিক কুরবানী চাচ্ছেন, কিন্তু আমরা অসচ্ছল; তুমি কি অনুগ্রহ করে আমাদেরকে কিছু ঋণ দিতে পারো? একথা শুনে কা'ব আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় আর বলে, আল্লাহ্‌র কসম! এখনও কিছুই হয় নি। সেদিন দূরে নয় যখন তোমরা এই ব্যক্তির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিবে। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) উত্তর দেন, আমরা তো মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ ও আনুগত্য শিরোধার্য করেছি। এখন এই জামাতের পরিণাম কি হয় তা আমরা দেখব। কিন্তু তুমি বলো যে, ঋণ দিবে কি না? কা'ব বলে, হ্যাঁ, তবে আমার কাছে কোনো কিছু বন্ধক রাখতে হবে। অতঃপর প্রথমে সে নারীদের,

এরপর পুত্রদের বন্ধক রাখার প্রস্তাব দেয়, [যেমনটি এখনই আমি বুখারীর বরাতে বর্ণনা করেছি।] অবশেষে অস্ত্র বন্ধক রাখার শর্তে কা'ব সম্মত হয়। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) এবং তার সাথিরা রাতে (আবার) আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে আসেন। রাত হতেই এই ছোট্ট দলটি সশস্ত্র হয়ে কা'বের বাড়িতে পৌঁছে এবং তাকে বাড়ি থেকে বাইরে ডেকে কথা বলতে বলতে এক দিকে নিয়ে যায়, আর কিছুক্ষণ পর হাঁটতে হাঁটতে তাকে কাবু করে সেসব সাহাবী যারা পূর্বেই অস্ত্রসজ্জিত ছিলেন, তরবারির আঘাত হানেন এবং তাকে হত্যা করেন। যাহোক, কা'ব নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) এবং তার সাথিরা সেখান থেকে দ্রুত মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন এবং তাঁকে এই হত্যার সংবাদ প্রদান করেন।

কা'বের নিহত হওয়ার সংবাদ জানাজানি হলে শহরে এক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে আর ইহুদীরা চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে যায়। পরের দিন প্রভাতে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয় এবং অভিযোগ করে যে, আমাদের সরদার কা'ব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি জানো, কা'ব কী কী অপরাধ করেছে? এরপর তিনি (সা.) সংক্ষিপ্ত পরিসরে কা'বের চুক্তি ভঙ্গ করা, যুদ্ধে প্ররোচিত করা, নৈরাজ্য, অশ্লীল কথা বলা এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি স্মরণ করান। তখন তারা ভয়ে চুপ হয়ে যায়। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের উচিত হবে অন্ততপক্ষে ভবিষ্যতে শান্তি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সহাবস্থান করা এবং শত্রুতা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন না করা। অতএব, ইহুদীদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন চুক্তি লেখা হয় আর ইহুদীরা নতুনভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তি ও নিরাপদে থাকার এবং বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের রীতি পরিহারের অঙ্গীকার করে। আর এই অঙ্গীকারনামা হযরত আলী (রা.)'র দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়। ইতিহাসে কোথাও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, এরপর কখনো ইহুদীরা কা'ব বিন আশরাফের হত্যার উল্লেখ করে মুসলমানদের ওপর দোষারোপ করেছে। কেননা তাদের হৃদয় অনুভব করত যে, কা'ব নিজের (অপরাধের) উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে।

অতএব, সে যুগের প্রচলিত বিধান বা পদ্ধতি অনুযায়ী কা'বের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে, তাতে ইহুদীদের নীরব থাকা বলে দেয়– তারা এই শাস্তি ও এই পদ্ধতিকে স্বীকার করেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক পরবর্তীতে এই আপত্তি করে যে, মহানবী (সা.) একটি অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন এবং এটি ভুল কাজ ছিল। জেনে রাখা উচিত যে, এটি অবৈধ হত্যাকাণ্ড ছিল না। কেননা কা'ব বিন আশরাফ মহানবী (সা.)-এর সাথে রীতিমতো শান্তিচুক্তি করেছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা করা তো দূরের কথা, সে এই বিষয়ের অঙ্গীকার করেছিল যে, সে প্রত্যেক বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করবে আর মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। এই অঙ্গীকার অনুযায়ী সে এ বিষয়টিও স্বীকার করেছিল, মদীনাতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যে ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, মহানবী (সা.) এর প্রধান হবেন এবং সব ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁর সিদ্ধান্ত সবার জন্য শিরোধার্য হবে। অতএব, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত এই চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীরা নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থাপন করত এবং তিনি (সা.) সে অনুযায়ী আদেশ জারি করতেন। এমতাবস্থায় কা'ব সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার লঙ্ঘন করেছে, [সেগুলো উপেক্ষা করেছে, পালন করে নি।]

মুসলমানদের সাথে বরং প্রকৃত অর্থে সমসাময়িক সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখানে মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্ন নয়, সে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেননা মহানবী (সা.) রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন। মদীনাতে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন করে এবং দেশে যুদ্ধের আগুন উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে, অধিকন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরব গোত্রগুলোকে ভয়ংকরভাবে ক্ষেপিয়ে তুলে। এরপর মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। এসব কিছু এমন অবস্থায় করেছে যখন কিনা মুসলমানরা পূর্বেই চতুর্দিক থেকে বিপদাপদে জর্জরিত ছিল, (সে) তাদের জন্য কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেয় আর এহেন অবস্থায় কা'বের অপরাধ বরং অপরাধের সমষ্টি এরূপ ছিল না যে, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ কোনো অযৌক্তিক কাজ গণ্য হবে। অতএব, এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আর অধুনাকালের তথাকথিত সভ্য দেশগুলোতে বিদ্রোহ, অঙ্গীকার ভঙ্গ, যুদ্ধের প্ররোচনা এবং হত্যা ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, তাহলে আপত্তি কীসের? বরং বর্তমানে ফিলিস্তিন এবং ইসরাঈলের মাঝে যা কিছু হচ্ছে তা তো অনেক বেশি মাত্রায় হচ্ছে আর অনেক দিক থেকে (তা) বৈধও নয়।

অতঃপর দ্বিতীয় আপত্তি হত্যারীতি সম্পর্কে। তাকে গোপনে রাতের আঁধারে কেন হত্যা করা হয়েছে? এ সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত যে, সে সময় আরবে নিয়মতান্ত্রিক কোনো সরকার-ব্যবস্থা ছিল না। একজন নেতা নির্বাচন করা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু কেবল তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত মনে করা হতো না, বরং নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক গোত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সামগ্রিকভাবে কোনো সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে হলে মহানবী (সা.)-এর কাছে আসত এবং নিজেদের পক্ষ থেকে গোত্রীয় সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে তারও ব্যবস্থা ছিল। এমতাবস্থায় এমন কোন আদালত ছিল যেখানে কা'বের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে রীতিমতো মৃত্যুদণ্ডাদেশ হস্তগত করা যেত? তার বিরুদ্ধে কি ইহুদীদের নিকট অভিযোগ করা সমীচীন ছিল, যাদের সে নেতা ছিল, বরং যারা কিনা নিজেরাই মুসলমানদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং প্রতিনিয়ত নৈরাজ্য সৃষ্টি করত? এ কারণে এই প্রশ্নই ওঠে না যে, ইহুদীদের কাছে যাওয়া যেত। সুলায়েম ও গাতফান গোত্রের কাছে সাহায্য চাওয়া যেত কি যারা কিনা বিগত কয়েক মাসে তিন-চারবার মদীনায় অতর্কিতে আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিল? [তারাও তার গোত্র ছিল।] কাজেই জানা কথা যে, তাদের কাছ থেকেও কোনো ন্যায়বিচার পাওয়া যেত না। যাহোক, সে সময়কার অবস্থার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করো এবং তারপর চিন্তা করে দেখো যে, এক ব্যক্তির উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড, যুদ্ধের প্ররোচনা, নৈরাজ্য ছড়ানো ও হত্যার ষড়যন্ত্র করার কারণে তার জীবনকে নিজের জন্য ও দেশের শান্তির জন্য বিপজ্জনক দেখে আত্মরক্ষার মানসে সুযোগ বুঝে তাকে হত্যা করা ব্যতীত মুসলমানদের নিকট আর কোন পথ খোলা ছিল? কেননা অনেক শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের জীবন বিপদাপন্ন হওয়া ও দেশের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার পরিবর্তে একজন দুষ্কৃতিকারী ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তির নিহত হওয়া অনেক উত্তম। আল্লাহ্ তা'লাও এটিই বলেছেন, নৈরাজ্য হত্যার চেয়েও ভয়ংকর।

যাহোক, হিজরতের পরে মুসলমান এবং ইহুদীদের মাঝে যে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সে অনুযায়ী মহানবী (সা.) একজন সাধারণ নাগরিকের মর্যাদা রাখতেন না, বরং তিনি সেই প্রজাতন্ত্রের প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন যা মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং

রাজনৈতিক বিষয়াদিতে যে সিদ্ধান্ত তিনি উপযুক্ত মনে করতেন তা জারি করার অধিকার তাঁকে দেয়া হয়েছিল। অতএব, তিনি (সা.) যদি দেশের শান্তির স্বার্থে কা'বের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন, তবে এতে আহামরি কোনো সমস্যা ছিল না, (অতএব) এ কারণে তেরোশ' বছর পর অধুনাকালের প্রাচ্যবিদরা ইসলামের ওপর যে আপত্তি উত্থাপন করছে তা অর্থহীন, কেননা সে সময় ইহুদীরা তাঁর (সা.) কথা শুনে কোনো আপত্তি করে নি।

এ সময়েই হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)'রও বিয়ে হয়, (তার) দ্বিতীয় বিয়ে। হযরত হাফসা (রা.) হযরত উমর (রা.)'র কন্যা ছিলেন এবং তার সাথে মহানবী (সা.)-এর বিয়ের বিষয়ে যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার বিবরণ হলো, হযরত হাফসা (রা.)'র স্বামী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ থেকে ফেরত আসার পথে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) হযরত হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করেন। এর বিশদ বিবরণ বুখারীতে এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে–

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হযরত খুনায়েস বিন হুযাফা (রা.)'র সংসারে বিধবা হন; তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রেওয়ায়েতে এসেছে, মদীনায় যখন তিনি মৃত্যু বরণ করেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করি। তাঁর কাছে হযরত হাফসার কথা বলি এবং প্রস্তাব দেই, আপনি যদি চান তাহলে হাফসা বিনতে উমরকে আপনার সাথে বিয়ে দিব। হযরত উসমান (রা.) বলেন, আমি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, অতঃপর আমি কয়েকদিন অপেক্ষা করি। হযরত উসমান (রা.) কয়েকদিন পর বলেন, বর্তমানে আমি বিয়ে না করাটাই সমীচীন বলে মনে করছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, এরপর আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে যাই এবং বলি, আপনি যদি চান তাহলে আমি হযরত হাফসা বিনতে উমরকে আপনার সাথে বিয়ে দিব। হযরত আবু বকর (রা.) নীরব থাকেন এবং আমাকে কোনো উত্তর দেন নি। হযরত উমর (রা.) বলেন, উসমানের চেয়ে আমি তার কাছ থেকে বেশি (কষ্ট) অনুভব করলাম অর্থাৎ বেশি (কষ্ট) অনুভব হলো যে, তিনিও নাকচ করে দিলেন। তিনি (রা.) বলেন, এরপর আমি কিছুদিন অপেক্ষা করি। তারপর মহানবী (সা.) হযরত হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব প্রেরণ করেন এবং আমি তাঁর (সা.) সাথে তাকে বিয়ে দেই।

সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে এ ঘটনাটি এভাবে লেখা আছে,

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র একজন কন্যা ছিলেন যার নাম হাফসা। তিনি খুনায়েস বিন হুযাফা'র স্ত্রী ছিলেন, যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন এবং বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফেরত আসার পথে খুনায়েস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থতা হতে আর প্রাণরক্ষা হয়নি। তার মৃত্যুর কিছুকাল পর হযরত উমর (রা.) হাফসার বিয়ে নিয়ে চিন্তিত হন। সে সময় হাফসার বয়স বিশ বছরের বেশি ছিল। হযরত উমর (রা.) স্বীয় প্রকৃতিগত সারল্য থেকে নিজেই হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)'র সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বলেন, আমার মেয়ে হাফসা বর্তমানে বিধবা। আপনি যদি পছন্দ করেন তাহলে তাকে বিয়ে করতে পারেন কিন্তু হযরত উসমান (রা.) নাকচ করে দেন। এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে একথা বলেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)ও নীরবতা পালন করেন এবং কোনো উত্তর দেন নি। এতে হযরত উমর (রা.) ভীষণ কষ্ট পান এবং তিনি সেই কষ্ট নিয়েই মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে সব কথা খুলে করেন। তিনি (সা.) বলেন, উমর! কোনো চিন্তা কোরো না। খোদা তা'লা চাইলে হাফসা, উসমান এবং আবু বকরের চেয়েও উত্তম স্বামী পাবে আর উসমান, হাফসার চেয়ে উত্তম স্ত্রী পাবে। তিনি (সা.) একথা এ কারণে বলেছিলেন

যে, তিনি হাফসাকে বিয়ে করার এবং নিজের মেয়ে উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.)'র সাথে বিয়ে দেয়ার সংকল্প করেছিলেন, যা হযরত আবু বকর এবং উসমান উভয়ে জানতেন আর এ কারণেই তারা হযরত উমর (রা.)'র প্রস্তাব নাকচ করেছিলেন। এর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)'র কাছে তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে দেন এবং এরপর তিনি (সা.) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে হযরত উমর (রা.)-কে হাফসার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.)'র এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে? তিনি (রা.) পরমানন্দে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ৩য় হিজরীর শা'বান মাসে হযরত হাফসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের অন্তর্ভুক্ত হন। এ বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আপনি হয়ত আমার পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট পেয়েছেন। আসলে আমি মহানবী (সা.)-এর সংকল্প সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম, কিন্তু আমি তাঁর (সা.) অনুমতি ব্যতীত তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারতাম না। এটা সত্য, তাঁর (সা.) যদি এই সংকল্প না থাকত তাহলে আমি সানন্দে হাফসাকে বিয়ে করতাম।

হাফসার বিয়ের একটি অসাধারণ বিশেষত্ব এটি ছিল যে, তিনি হযরত উমর (রা.)'র কন্যা ছিলেন, যিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র পর সকল সাহাবীর মাঝে সর্বোত্তম বলে পরিগণিত হতেন এবং মহানবী (সা.)-এর বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন ছিলেন। অতএব, পারস্পরিক সম্পর্ককে অধিক সুদৃঢ় করতে এবং হযরত খুনায়েস বিন হুযাফার অকাল মৃত্যুতে হযরত উমর এবং হযরত হাফসা যে দুঃখ পেয়েছিলেন সেই দুঃখ দূর করার জন্য মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত হাফসাকে বিবাহ করাকে সঙ্গত মনে করেন আর অপর যে প্রজ্ঞাটি দৃষ্টিতে ছিল তা হলো, মহানবী (সা.)-এর যত বেশি সহধর্মিণী থাকবে ততই নারীদের মাঝে, যারা মানবজাতির অর্ধাংশ, বরং অনেক দিক থেকে উত্তমার্ধ, (তাদের দ্বারা) তবলীগ ও তালীমের কাজ আরো ব্যাপক পরিসরে এবং অতি সহজে ও সুন্দরভাবে করা সম্ভব হবে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরও বলেন, বিবাহের সময় হযরত হাফসা (রা.)'র বয়স ছিল প্রায় ২১ বছর আর হযরত আয়েশা (রা.)'র পর সাহাবীদের মাঝে তিনি যেহেতু সর্বোত্তম এক ব্যক্তির কন্যা ছিলেন, তাই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের মাঝে তাঁর এক বিশেষ মর্যাদা ছিল আর হযরত আয়েশা (রা.)'র সাথেও তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল; টুকটাক কিছু টানাপোড়েন ছাড়া, যা এমন সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটেই থাকে, তারা উভয়ে পরস্পর মিলেমিশে থাকতেন। হযরত হাফসা (রা.) লেখাপড়া জানতেন। হাদীসে একটি রেওয়ায়েত পাওয়া যায় যে, তিনি একজন মহিলা সাহাবী শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ্‌র কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তিনি উনচল্লিশ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন যখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৬৩ বছর।

এরপর এই সময়ের মধ্যেই হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র জন্ম হয়। হযরত ইমাম হাসান বিন আলী বিন আবু তালেব রমযানের মধ্যভাগে তৃতীয় হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে বলেন, তৃতীয় হিজরীর শা'বান মাসে তাঁর জন্ম হয়। আবার অনেকে বলেন, উহুদের যুদ্ধের এক বছর পর তাঁর জন্ম হয়, আবার অনেকের মতে দুই বছর পর হয়। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, প্রথমোক্ত মত সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ও সঠিক। হযরত আলী (রা.) তাঁর নাম রাখেন **হারব,** কিন্তু মহানবী (সা.) সেই নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন **হাসান**। জন্মের সপ্তম দিনে তিনি (সা.) তার আকীকা দেন এবং তার মাথার চুল কামিয়ে দেন এবং আদেশ দেন যে, তার চুলের সমপরিমাণ রুপা যেন দানখয়রাত করা হয়। একদা উম্মে ফযল নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র

রসূল (সা.)! আমি স্বপ্নে দেখেছি, আপনার একটি অঙ্গ আমার গৃহে অথবা আমার কক্ষে। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি উত্তম স্বপ্ন দেখেছ। ফাতেমার গর্ভে এক সন্তান জন্ম নিবে, তুমি তার দেখাশোনা করবে এবং তুমি তাকে **কুসুমের** সাথে দুধ পান করাবে। উম্মে ফযল মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)'র সহধর্মিণী ছিলেন এবং তার ছেলের নাম ছিল **কুসুম**। অতএব, হযরত হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করেন এবং উম্মে ফযল তাকে কুসুমের সাথে দুধ পান করান। হযরত হাসান বিন আলী (রা.)'র কাছে নিবেদন করা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কোনো কথা আপনার স্মরণ আছে কি? থাকলে বলুন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর একটি কথা আমার স্মরণ আছে। আমি একবার সদকার খেজুরের মধ্য থেকে একটি খেজুর নিয়ে আমার মুখে দেই। তা দেখে মহানবী (সা.) আমার মুখ থেকে সেটি বের করে ফেলেন, এমতাবস্থায় যে সেটিতে আমার মুখের লালা লেগে ছিল; এবং তিনি সেটিকে সদকার খেজুরের সাথে মিলিয়ে ফেলেন। কেউ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! একটি খেজুর খেলে সমস্যা কী? মহানবী (সা.) বলেন, আমাদের জন্য অর্থাৎ আলে মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য সদকা হালাল নয়।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, **হযরত হাসানের চেয়ে বেশি মহানবী (সা.)-এর কেউ সদৃশ ছিলেন না।** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) হযরত হাসান (রা.)-কে নিজের কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। (তখন) কেউ বলে, হে রাজপুত্র! তুমি কতই না উত্তম আরোহীর ওপর আরোহণ করেছ! মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, এই আরোহণকারীও তো উত্তম। তিনি (সা.) তাঁর দৌহিত্রকে অনেক ভালোবাসতেন।

হযরত বারা' (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে দেখেছি, তিনি (সা.) হযরত হাসান বিন আলী (রা.)-কে নিজের কাঁধে তুলে রেখেছিলেন আর একথা বলছিলেন যে, হে আল্লাহ্‌! আমি তাকে ভালোবাসি, তুমিও তার প্রতি ভালোবাসা রেখো। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে একথারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র মৃত্যু বিষপ্রয়োগে হয়েছিল। যাহোক, হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র জন্মের উল্লেখ করতে গিয়ে বর্ণনা করেন,

দ্বিতীয় হিজরীর বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ফাতেমা (রা.)'র বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় হিজরী সনের রমযান মাসে অর্থাৎ বিয়ের দশ মাস পর তাদের পরিবারে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন যার নাম মহানবী (সা.) হাসান রেখেছেন। ইনি সেই হাসান যিনি পরবর্তীতে মুসলমানদের মাঝে ইমাম হাসান আলাইহের রহ্‌মত উপাধি লাভ করেন। হযরত হাসান (রা.) আকার-আকৃতি ও অবয়বের দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে অনেকাংশে সামঞ্জস্য রাখতেন। মহানবী (সা.) যেভাবে তাঁর সন্তান হযরত ফাতেমা (রা.)-কে ভীষণ ভালোবাসতেন, অনুরূপভাবে হযরত ফাতেমা (রা.)'র সন্তানদের প্রতিও তাঁর বিশেষ ভালোবাসা ছিল। অনেকবার তিনি (সা.) বলেছেন, হে খোদা! আমি এই শিশুদের ভালোবাসি, তুমিও এদের ভালোবাসো এবং যারা এদেরকে ভালোবাসবে তুমি তাদেরকেও ভালোবেসো। অনেকবার এমন হয়েছে যে, মহানবী (সা.) নামাযরত থাকতেন আর হাসান (রা.) তাঁকে আঁকড়ে ধরতেন, রুকু করার সময় তাঁর দুপায়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা বানিয়ে বেরিয়ে যেতেন। কখনো কখনো সাহাবীরা তাকে থামাতে চাইলে তিনি (সা.) সাহাবীদের বারণ করতেন যে, তাকে বাধা দিও না। প্রকৃতপক্ষে

যেহেতু তার (ইমাম হাসান) এভাবে আঁকড়ে থাকার ফলে তাঁর (সা.)-এর মনোযোগে বিঘ্ন ঘটতো না তাই তিনি (সা.) তার নিষ্পাপ ভালোবাসার শিশুসুলভ প্রকাশের মাঝে বাধ সাধতে চান নি। ইমাম হাসান (রা.) সম্পর্কে একবার মহানবী (সা.) বলেন, আমার এই সন্তান সৈয়্যদ অর্থাৎ নেতা এবং এমন এক সময় আসবে যখন খোদা তা'লা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি দলের মাঝে সন্ধি বা মীমাংসা করাবেন। অতএব, যথাসময়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার মতে হযরত হাসান (রা.) খুবই ভালো কাজ করেছেন যে, খিলাফতের (দায়িত্ব) থেকে সরে গিয়েছেন। পূর্বেই সহস্র সহস্র প্রাণহানী ঘটেছে; আরো রক্তপাত ঘটুক– এটি তিনি পছন্দ করেন নি, তাই (তিনি) মুআ'বিয়ার কাছ থেকে ভাতা নিয়ে নেন। যেহেতু হযরত হাসান (রা.) এই সন্ধি করেন (তাই) হযরত হাসানের এ কাজের কারণে শিয়া সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত আসে। একারণে (তারা) হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র প্রতি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে নি। আমরা তো উভয়ের গুণকীর্তন করি (অর্থাৎ হযরত হাসানেরও এবং হযরত হুসাইনেরও।) প্রকৃত বিষয় হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি বা স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। হযরত ইমাম হাসান (রা.) এটি পছন্দ করেন নি যে, মুসলমানদের মাঝে গৃহযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হোক এবং রক্তপাত ঘটুক। তিনি (রা.) শান্তিপ্রতিষ্ঠাকে দৃষ্টিপটে রাখেন। **'নরাধম পাপীষ্ঠের হাতে বয়আত গ্রহণ করা'** হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) পছন্দ করেন নি, কেননা এতে ধর্মের মাঝে বিকৃতি দেখা দেয়। উভয়ের উদ্দেশ্য সৎ ছিল। **'ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত'** (নিশ্চয় সংকল্পের ওপর কর্মফল নির্ভর করে)। এই ছিল তাদের সন্তানদের ঘটনা।

যেমনটি আমি বিগত কয়েক খুতবায় ফিলিস্তিনবাসীর জন্য দোয়ার অনুরোধ করছি, আজও এ সম্পর্কে বলতে চাই। দোয়া অব্যাহত রাখুন। এখন তো অত্যাচার-নিপীড়ন চরম সীমায় উপনীত হচ্ছে। হামাসের সাথে যুদ্ধের অজুহাতে নিষ্পাপ শিশু, নারী, বৃদ্ধ, অসুস্থদের হত্যা করা হচ্ছে। যুদ্ধের সকল রীতিনীতিকে এই তথাকথিত সভ্য সমাজ উপেক্ষা করছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান রাষ্ট্রগুলোকে বিবেক-বুদ্ধি দিন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বাহাত্তর-তিয়াত্তর বছর পূর্বে সর্তক করেছিলেন যে, মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক, একে একে নিজেদেরকে ধ্বংস করবে নাকি একাত্ম হয়ে নিজেদের ঐক্য বহাল রাখবে এবং প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কারণ যদি তারা ঐক্যবদ্ধ না হয় তবে এক এক করে ধ্বংস হবে। হায় পরিতাপ! আজও যদি এই লোকেরা এই কথা অনুধাবন করে ঐক্যবদ্ধ হতো! অবস্থা তো এমন যে, কেউ আমাকে বলেছে, যারা উমরা করতে যাচ্ছে তাদের বলা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে ফিলিস্তিন বা ইসরাঈলের যুদ্ধ সম্পর্কে কোনো কথা বলা যাবে না। সেখানকার প্রশাসন ভিসা দেয়ার সময় এই নির্দেশনা প্রদান করছে। যদি একথা সত্য হয় তবে এক মুসলমান রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এটি হবে চরম ভীরুতা প্রদর্শন। যাহোক, উমরার ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা উচিত। এই (ইবাদতের) সময় নিঃসন্দেহে এমন কোনো কথা বলা হবে না, কিন্তু নির্যাতিত ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য অবশ্যই দোয়া করা উচিত। হায়! যারা (উমরাতে) যাচ্ছেন তারা যদি এই দোয়াকেও স্মরণ রাখতো! বর্তমানে মুসলমান রাষ্ট্রগুলোও সামান্য আওয়াজ তুলছে, তবে খুবই ক্ষীণ আওয়াজ উঠছে। এরচেয়ে তীব্র আওয়াজ তো কোনো কোনো অমুসলমান ব্যক্তি, বিভিন্ন রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রও উত্তোলন করেছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের মাঝেও সাহস এবং প্রজ্ঞা সৃষ্টি করুন।

জাতিসংঘের মহাসচিবও জোরালো কথা বলেন, আজকাল তো আরো বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলছেন। কিন্তু মনে হচ্ছে, তার কথার কোনো গুরুত্ব নেই। মনে হচ্ছে, এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর অথবা এই যুদ্ধের যদি আরও বিস্তৃতি ঘটে এবং বিশ্বযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে তবে জাতিসংঘেরও অবসান ঘটবে। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। মনে হচ্ছে, এখন পৃথিবী নিজের ধ্বংসকে নিকটতর করছে। আর এই ধ্বংসযজ্ঞের পর যারা বেঁচে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক-বুদ্ধি দিন, তারা যেন খোদা তা'লার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে এবং তাঁর দিকে (যেন) ফিরে আসে। যাহোক, আমাদের এ প্রেক্ষিতে অনেক বেশি দোয়া করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীর প্রতি কৃপা করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)